প্রথম অধ্যায়

বাংলা এবং উর্দু ভাষা ঃ ইতিহাসের কালানুক্রমে এদের অবস্থান এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ—

'ভাষা' হল এক শ্রেণীর সংকেত; যার দ্বারা মানুষ তার ভাবকে প্রকট করে। 'ভাষা' শব্দটি সংস্কৃত 'ভাষ' ধাতু দ্বারা গঠিত, যার অর্থ 'বলা'। মানুষ তাঁর ভাব বিনিময়ের প্রধানতম মাধ্যম হিসেবে ভাষাকে ব্যবহার করে। সমগ্র প্রাণীজগতের মধ্যে মানুষই একমাত্র ভাষার সৃষ্টি করতে সক্ষম। আধ্যাত্মবাদীরা মনে করেন ভাষা ঈশ্বরের মহান দান; ঈশ্বরই এর সৃষ্টিকর্তা। অন্যদিকে বস্তুবাদীগণ মনে করেন মানুষই তার আত্মিক প্রয়োজনের তাগিদ থেকে ভাষার সৃষ্টি করেছে এবং পরিমার্জনের ফলে তাকে শিষ্টরূপ দান করেছে। প্রাণীজগতের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রাণী ধ্বনি-সংকেতের মাধ্যমে জীব জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করে থাকে। প্রয়োজনের ব্যতিক্রমে ধ্বনি-সংকেতের ব্যতিক্রম ঘটে থাকে। ভাষা সৃষ্টির আদিপর্বে মানুষও বিভিন্ন ধ্বনি-সংকেতের মাধ্যমে ভাব বিনিময় করত। এমনকি বর্তমানেও যখন মানুষ বিশুদ্ধ ভাষা প্রয়োগে সক্ষম, তখনও বহু ক্ষেত্রে ধ্বনি-সংকেতের ব্যবহার করে থাকে, যা বিশুদ্ধ ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয়। মানুষের যেমন জৈবিক প্রয়োজন মেটানোর তাগিদ আছে, তেমনি ভাব বিনিময়ের খাতিরে ধ্বনি-সংকেতেরও প্রয়োজন আছে; আর সেই প্রয়োজনের তাগিদ থেকেই পরিমার্জিত ভাষার উৎপত্তি।

একথা স্পষ্ট যে কার্যসম্পাদনের উদ্দেশ্যে ধ্বনি-সংকেতের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপনের প্রচেষ্টা থেকেই ভাষার উৎপত্তি। ভাষাবিজ্ঞানীগণ দেখিয়েছেন যে, স্থূল চিন্তনশক্তিসম্পন্ন পশুদের মধ্যেও ধ্বনি-সংকেতের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ভাষা গঠনের ক্ষেত্রে মানুষের সাফল্যের প্রধানতম কারণ মানুষের গঠনগত প্রকৃতির ভিন্নতা। ভাষাবিজ্ঞানীগণ মনে করেন ভাষার উৎপত্তি মানুষের প্রয়োজনের কোনো সাধারণ স্তর থেকে হয়নি, বরং মানুষের চিন্তাশক্তির পরিমার্জনের ফলস্বরূপ ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। জীব জগতের উন্নত জীব মানুষ তার বুদ্ধি এবং চিন্তাশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাহ্য-জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের নিমিত্ত ধ্বনি-সংকেতের স্তরকে অতিক্রম করে ভাষাস্তরে উন্নীত হয়েছে। মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত শব্দ কোনো পদার্থের সংকেত রূপে কাজ করে। তবে শব্দ সর্বদা ধ্বনি-সংকেত মাত্র হয়ে থাকে না, বরং নির্দিষ্ট স্তরে উন্নীত হয়ে তা পরিমার্জিত ভাষায় পরিণত হয়। যেমন একটি শিশু জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ণ অর্থবোধক ভাষার ব্যবহার করে না; সে প্রথমে অস্পষ্ট ধ্বনি-সংকেতের ব্যবহার করে এবং ধীরে ধীরে ধ্বনি-সংকেতের স্তরকে অতিক্রম করে পূর্ণ অর্থবহ ভাষা ব্যবহারের স্তরে উন্নীত হয়।

ভাষা উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের দিকটিকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীগণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে

বিচার করেছেন। ভাষার বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা ও গবেষণার রীতিকে তাঁরা 'বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান' বলে অভিহিত করেছেন। বিশিষ্ট ভাষাবিদ্ ড. রামেশ্বর শ তাঁর 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' গ্রন্থে ভাষা-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রটিকে বিশেষ পারদর্শিতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি Liguistics-কে 'বিশুদ্ধ ভাষা তত্ত্ব' তথা 'ভাষাবিজ্ঞান' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর কথায়, "Liguistics-কে বাংলায় ভাষাবিজ্ঞান বা বিশুদ্ধ ভাষাতত্ত্ব বলি, তার কারণ Linguistics হচ্ছে Science of Language বা ভাষার বিজ্ঞান অর্থাৎ ভাষা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা।"[১]

বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ড. রামেশ্বর শ ভাষার সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন, "ভাষা হল মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত যথেচ্ছভাবে নির্বাচিত (arbitrary) বাক্যমধ্যে বিধিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত এমন কতকগুলি অর্থবহ ধ্বনিগত প্রতীক যার সাহায্যে বিশেষ-বিশেষ জাতি বা জনগোষ্ঠীর লোকেরা পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় করে।"[২]

আবার বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী স্টার্টেভান্ট ভাষার সংজ্ঞা দেন এইভাবে— "A language is a system of arbitrary vocal symbol by wich members of a social group co-operate and intaract."[৩]

আমরা জানি ভাষা ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা উচ্চারিত হলেও তা একাধারে সমাজের সঙ্গে যোগসূত্র রচনায় সাহায্য করে। সুতরাং আমরা বলতে পারি ভাষা হলো সেই অর্থবহ ধ্বনি সমষ্টি যা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিকে বা সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—"মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগ্-যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোন বিশেষ জনসমাজে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দ সমষ্টিকে ভাষা বলে।"[৪]

ভাষার বিভিন্ন দিকের মধ্যে উৎপত্তিগত দিকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা বিভিন্ন স্তর পরম্পরার মধ্য দিয়ে উৎপত্তি লাভ করে এবং বিভিন্ন স্তর পরম্পরার মধ্য দিয়েই তার বিকাশ সাধিত হয়। গবেষকগণের মতে ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রুচিবোধ সক্রিয় হলেও ভাষার পরিবর্তন সমাজ নিরপেক্ষ নয়। মানুষের চিন্তাশক্তির প্রয়োগধর্মিতা ভাষার ক্রমবিকাশে প্রভাব ফেলে। মানুষের মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তির প্রয়োগের ফলে ভাষার বোধ জন্মায় এবং অঙ্গ-সঞ্চালনের মাধ্যমে ভাষার প্রকাশ ঘটে।

ভাষাবিদ্ ড. রামেশ্বর শ এ বিষয়ে বলেছেন—"চিন্তা ও ভাষা মূলত একই; পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, চিন্তা হল আত্মার নিজের সঙ্গে নিজের নীরব কথোপকথন, আর যে প্রবাহটি আমাদের চিন্তা থেকে ধ্বনির আশ্রয়ে ওষ্ঠের মধ্য দিয়ে বয়ে আসে তা-ই হল ভাষা।"[৫]

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষা-গবেষণার বিষয়টি আধুনিক যুগে বিকাশলাভ করলেও প্রাচীন ভারতীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্ পাণিনি প্রমুখ তাঁদের ভাষা-বিষয়ক আলোচনায় তথা বিশ্লেষণের কাজে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তবে সেক্ষেত্রে বিশ্লেষণ পদ্ধতির নামগত পার্থক্য ছিল। প্রাচীন ভাষা বিষয়ক আলোচনা মূলত ছিল ব্যাকরণ ভিত্তিক। ভাষার ব্যাকরণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—"যে বিদ্যার দ্বারা কোনও ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপটি আলোচিত হয় এবং সেই ভাষার পঠনে ও লিখনে এবং তাহাতে কথোপকথনে শুদ্ধ রূপে তাহার প্রয়োগ করা যায়, সেই বিদ্যাকে সেই ভাষার ব্যাকরণ (Grammar) বলে।"[৬]

ভাষার প্রচলিত রূপের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ব্যাকরণের মূল উপাদ্য বিষয়। ভাষার ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতিই আরো বিস্তারিত রূপ গ্রহণ করে ভাষার বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণে।

আধুনিক ভাষাশাস্ত্রে ভাষার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের বিধি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশ্লেষণের বিধিগত প্রয়োগে যে কোনো ভাষা সম্বন্ধে বিভিন্ন স্তর পরম্পরায় আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন—ধ্বনি, পদরচনা, বাক্যবিন্যাস এবং শব্দার্থগত দিক। এই পদ্ধতিতে কোনো ভাষার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতের পাশাপাশি সমসাময়িক প্রেক্ষিতের আধারে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণও সম্ভব। পাশাপাশি এই পদ্ধতিতে দুটি ভাষার পারস্পরিক তুলনাগত বিশ্লেষণ সম্ভব,—যাকে 'তুলনাত্মক ব্যাকরণ' আখ্যাতেও ভূষিত করা যায়।

বাংলা এবং উর্দু ভাষার সম্পর্ক চিরাচরিত, কারণ দুটি ভাষাই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের ভারতীয় আর্যভাষা থেকে উৎপন্ন। তবে মুঘল আমলে বাংলাদেশের সঙ্গে দিল্লীর যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার সময় থেকে বাংলা সাহিত্যে হিন্দী এবং উর্দুর প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ করা যায়। মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা এবং উর্দু ভাষার পারস্পরিক সম্পর্কের কথা সম্পর্কে জানান—"Since the Mughal Conquest of Bengal in 1576, A.D. Urdu began to influence the Bengali language and literature. As a result of this a distinct Muslim Bengali Literature in Urduised Bengali and with themes derived from the Urdu Literaturerose in the early 18th century. This is called the Punthi Literature."[৭]

বাংলা এবং উর্দুভাষার তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে বলা যায়, যেহেতু ভাষা পক্ষান্তরে সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ; তাই ভিন্ন ভাষা তথা ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানে পক্ষান্তরে সংস্কৃতির উন্নতি সাধন হয় বলেই মনে করা যেতে পারে। যেমন এমন অনেক শব্দ আছে, যার ব্যবহার আমরা বাংলা এবং উর্দু উভয় ভাষাতেই প্রযুক্ত হতে দেখি,

যদিও উচ্চারণগত দিক থেকে সূক্ষ্ম পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। তবে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে ভাষার এই আদান প্রদানের বিষয়টি অবশ্যই উভয় ভাষা গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করা আবশ্যক। একই ভাবে বাংলা এবং উর্দু ভাষার তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে আবশ্যিক ভাবেই এসে যায় হিন্দী ভাষার প্রসঙ্গ; কারণ উর্দু ভাষাকে মূলত হিন্দী ভাষারই পৃথক সাহিত্যিক রূপ বলে অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ্ মনে করেন। তাঁদের মতে হিন্দী উর্দু একই জাতীয় ভাষা।

ভাষা সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ। তাই তার বিকাশের বিষয়টিকে সেই সংস্কৃতিগত দিক থেকেই বিচার করে দেখতে হবে। যে কোনো উন্নত ভাষাই সেই সমাজের সাংস্কৃতির উন্নতি বিধানের সহায়ক হয়ে থাকে। তাই মানুষ যেমন তার পরিবেশকে পরিমার্জনের মাধ্যমে আরো উন্নত করে তোলে, তেমনি সমাজের সংস্কৃতির মানদণ্ডকে উন্নত করার প্রয়োজনে ভাষাকেও পরিমার্জনের দ্বারা উন্নত করে তোলে। কারণ ভাষা যেমন সংস্কৃতির বাহক, তেমনি মানব প্রকৃতি তথা সামাজিক সংস্কৃতির উন্নতি বিধানেরও সহায়ক।

কোনো ভাষাকে তখনই 'সম্পূর্ণ ভাষা' হিসেবে মান্য করা হয়, যখন সেই ভাষার দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে উৎপন্ন ভাবকে সরলতাপূর্বক ব্যক্ত করার শক্তি নিহিত থাকে। কোনো 'ভাষা পরিবারের' জন্ম সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানীদের অভিমত হল এই যে, প্রত্যেক ভাষা পরিবারের জন্ম কোনো আদি ভাষা থেকেই হয়ে থাকে। যেমন—'আদি আর্য', 'আদি দ্রাবিড়' ইত্যাদি। কিন্তু যাকে প্রকৃত অর্থে 'ভাষা' বলা হয় তার জন্ম সামাজিক বিকাশের বিশেষ কেন্দ্র থেকে হয়ে থাকে।

ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখব ভারতবর্ষ এমন এক দেশ যেখানে বিভিন্ন জাতির মানুষ বসবাস করে এবং তাদের ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন। এই বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে ভারতীয় সংস্কৃতি এক ভিন্ন মাত্রিক রূপ পরিগ্রহ করে। ভারতের বুকে বহু শতাব্দী ধরে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের আগমন ঘটে। তারা একদিকে বংশপরম্পরায় চলে আসা নিজ সংস্কৃতিকে রক্ষা করে নিজেদের এদেশের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। পাশাপাশি এদেশে নিজেদের উপযোগী সংস্কৃতি নির্মাণের কাজে নিবিষ্ট থাকে। এক কথায় ভারতীয় সংস্কৃতির সূচনালগ্নে অস্ট্রিক (নিষাদ), দ্রাবিড়, তিব্বতী চীনী (কিরাত) এবং আর্যজাতির সংমিশ্রণ 'ভারতীয় সংস্কৃতি'র নির্মাণ কার্যকে প্রভাবিত করেছিল।

ভাষাবিদ্গণ মনে করেন ভারতের প্রাচীন অধিবাসী নেগ্রীটো জাতিভুক্ত মানুষের জীবন অধিকাংশে খাদ্য সংগ্রহের কাজেই অতিবাহিত হয়েছে। সুতরাং ভারতীয় সংস্কৃতির নির্মাণে

তাদের অবদান নেই বললেই চলে। নেগ্রীটো জাতির কোনো অস্তিত্ব পরবর্তীতে আর লক্ষ করা যায় না; হয় তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, নয় তো অন্য জাতির সঙ্গে মিশে গেছে। ভারতের ঐতিহাসিক, সামাজিক, ধর্মীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তাতে সর্বাধিক উন্নত ধারার প্রবর্তনা ঘটায় আর্যসংস্কৃতির ধারা। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে আর্যভাষা একটি মহত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাপরিবারের অন্তর্গত প্রাচীন ও নবীন ভাষাসমূহ আদি ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ভারতীয় আর্যভাষার পরিমার্জনের ফলে প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ ভাষার সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটেছে। আর তারই পরিমার্জনের ফলে জন্ম হয়েছে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার; ভাষা বিজ্ঞানের পর্যালোচনায় যার ভূমিকা অপরিসীম।

ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষা বংশই হল বাংলা এবং উর্দু ভাষার আদি উৎস। তবে এই উৎস থেকে সরাসরি এই দুটি ভাষার জন্ম হয়নি, বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর পরম্পরায় পরিবর্তনের মাধ্যমে এই দুটি ভাষার জন্ম হয়েছে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশ থেকে দশটি প্রাচীন ভাষা বা শাখার জন্ম হয়, সেগুলি হল—ইন্দো-ইরানীয়, বাল্‌তো-স্লাভিক, আল্বানীয়, আর্মেনীয়, গ্রীক, ইতালিক বা লাতিন, টিউটনিক বা জার্মানিক, কেলতিক্, তোখারীয় এবং হিত্তীয়। ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠী নিজেদের আর্য বলে ঘোষণা করে। এই শাখাটি দুটি উপশাখায় বিভক্ত হয়—ইরানীয় এবং ভারতীয় আর্য। ইরানীয় শাখাটি ইরান-পারস্যে প্রবেশ করে অন্যদিকে ভারতীয় আর্য শাখাটি আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভারতে প্রবেশ করে। আর্য ভাষার সাড়ে তিন হাজার বছরের বিবর্তনের ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করেছেন ভাষাবিজ্ঞানী রামেশ্বর শ। সেই বিভাজনটি এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১. প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা (Old-Indo-Aryan=OIA) আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। এই যুগের আর্যভাষার নাম—বৈদিক ভাষা বা সংস্কৃত ভাষা।

২. মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা (Middle Indo-Aryan = MIA) আনুমানিক ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই যুগের আর্যভাষার নাম-পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ।

৩. নব্য ভারতীয় আর্যভাষা (New-Indo-Aryan=NIA) আনুমানিক ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত। এই যুগের ভাষার নাম—বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, অবধী ইত্যাদি।[৮]

ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মাগধী, অপভ্রংশের পূর্বী রূপ থেকে বিকশিত এক আধুনিক আর্যভাষা হল বাংলা ভাষা। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষার প্রারম্ভকাল ৯৫০ (ইং) মনে করেন এবং তিনি

এর ইতিহাস বা বিকাশকালকে 'প্রাচীন কাল' (৯৫০ -১২০০), 'মধ্যকাল' (১২০০-১৮০০) এবং 'আধুনিক কাল' (১৮০০-বর্তমান কাল পর্য্যন্ত)—এই তিন কালপর্বে বিভাজিত করেছেন। এর মধ্যে মধ্যকালকে তিনি আবার তিনটি কালপর্বে বিভাজিত করেছেন—'সংক্রান্তি কাল' (১২০০-১৩০০), 'পূর্ব মধ্যকাল' (১৩০০-১৫০০) এবং উত্তর মধ্য কাল' (১৫০০-১৮০০)। ড. সুকুমার সেন প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে বাংলা ভাষার মোট পাঁচটি উপভাষা আছে। 'রাঢ়ী (মধ্য-পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা), ঝাড়খণ্ডী (দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের উপভাষা), কামরূপী (উত্তর-পূর্ববঙ্গের উপভাষা)।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাতীয় ভাষারূপে হিন্দীর ব্যাপক প্রসার হয়েছিল। বিভিন্ন জনপদে তাদের উপভাষার মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে হিন্দীভাষা ব্যবহৃত হতো। অন্যত্র যে হিন্দী ভাষার প্রসার হচ্ছিল তা বিভিন্ন জনপদে তাদের উপভাষা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সেখানকার স্থানীয় রূপকে পরিগ্রহণের মাধ্যমে। জাতীয় ভাষারূপে হিন্দী ভাষার বিকাশ-প্রক্রিয়া বর্তমানেও চলছে। পরিশীলিত ভাষার মুখ্য দুটি রূপ বর্তমানেও প্রচলিত আছে—হিন্দী এবং উর্দু। এই দুটি রূপের মধ্যে হিন্দী ক্রমশঃ মান্যরূপ পরিগ্রহ করে আর উর্দু একটি বিশিষ্ট 'বোলী' বা কথ্য ভাষার রূপ পরিগ্রহ করে। ভাষাবিজ্ঞানীগণের মতে উর্দু আরবী-ফারসী প্রভাবিত জাতীয় ভাষার একটি বিশিষ্ট রূপ, যার বিকাশ ও ব্যবহার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

পদ্ম সিংহ শর্মা তাঁর 'হিন্দী উর্দু অর হিন্দুস্থানী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ আকবরের কিছু পরে শাহজাহানের সময়কে উর্দুর জন্মকাল বলে মনে করেছেন—"জব কি শাহজহাঁ বাদশাহ নে সন ১৬৪৮ (ইং)-এ শহর শাহজহানবাদ আবাদ কিয়া অর হর মুল্ক কে লোগোঁ কা মজমা হুয়া, ইস জমানে মে ফারসী জবান অর হিন্দী ভাষা বহুত মিল গয়ী, অর বাজে ফারসী লফ্‌জোঁ অর অক্সর ভাষাকে লফ্‌জোমে বসবব কসরত ইস্তেমালকে অগ্যুর ব তবদীল হো গয়ী। গরজ কি লস্কর বাদশাহী অর উর্দু এ মুঅল্লা মেঁ ইন দোনোঁ জবান কী তরকীব সে নয়ী জবান পৈদা হো গয়ী অর ইসী সবব সে জবান কা উর্দু নাম হুয়া।"[৯]

উর্দু ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে সৈয়দ এহতিশাম হুসেন 'উর্দু সাহিত্য কা ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, "জব লড়াইয়োঁ, চঢ়াইয়োঁ, আক্রমণোঁ অর সংগ্রামোঁ সে উৎপন্ন হোনেবালী ঘৃণা কী লহর উঠী তো হিন্দুওঁ অর মুসলমানোঁ কে হৃদয়মে মেল মুহব্বতকে সোত ফুট পড়ে, জিস্হোনেঁ কলা অর ধরম সবকী লপেট মেঁ লে লিয়া অর জিনকে ভাবোঁ, বিচারোঁ অর কল্পনাওঁ কো এক দুসরে কে সপীম কর দিয়া। ভক্তি কো এক লোকপ্রিয় অর উস সময়

কী সমস্যাওঁ কো দেখতে হুয়ে প্রগতিশীল আন্দোলন বনানে মেঁ, হিন্দু অর মুসলমান দোনোঁ ভক্তোঁ কা হাথ হ্যায়। জব আচার বিচার কী সীমাত্রঁ ইস প্রকার নিকট আ গয়ী হো, তব এক এইসী ভাষাকে জন্ম লেনে কী সম্ভাবনা দূর নহী রহ জাতী জো মিলে জুলে সামাজিক জীবন কা চিহ্ন হো।"[১০]

সৈয়দ এহতিশাম হুসেন উর্দুর উৎপত্তি সম্বন্ধে সূফীর ধর্ম প্রচারের প্রসঙ্গকেও এনেছেন—"হম য়হ ভী সমঝতে হ্যায় কি উস সময় কৌঈ বনীবয়ায়ী ভাষা প্রচলিত নহী রহী হোগী জিস মেঁ বহ ধর্ম অর ভক্তিকে গহরে বিচার সরলতা সে প্রকট কর সকেঁ। ইসলিএ উনকো মজবুরণ বহুত সে ফারসী আরবীকে শব্দ বোলচালকী ভাষা মে মিলানে পড়তে হোগেঁ।"[১১]

পণ্ডিত রামবিলাস শর্মার মতে, হিন্দী-উর্দুর এক সামান্য আধার হল বোলচালের খড়ীবোলী। এই খড়ীবোলীতে আরবী-ফারসীর কিছু বা অন্য ভাষার বেশ কিছু শব্দ যুক্ত হয়ে কোনো নতুন ভাষা উৎপন্ন হয়নি। এই খড়ীবোলী মুসলমানের আগমনের পূর্বেও ছিল, তাদের শাসনকালেও ছিল এবং বর্তমানেও আছে। উর্দুভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে দুটি মূল্যবান তথ্য হল এই যে—প্রথমত বাইরে থেকে যে মুসলমানগণ ভারতে এসেছেন, তারা খুব শীঘ্রই এখানকার জাতির অংশ হয়ে গেছেন। তারা নিজেকে তুর্কী, পাঠান ও মুঘল বলে ঘোষণা করেন, কিন্তু জাতীয়তার মুখ্য চিহ্ন 'ভাষা' তাদের থেকে খুব শীঘ্রই বিচ্ছিন্ন হয়। কাশ্মীর, পাঞ্জাব, বাংলা, সিন্ধু, গুজরাত, 'হিন্দুস্থান'—সব প্রদেশেই তারা সেখানকার ভাষা গ্রহণ করে। দ্বিতীয়ত, এখানে মোটামুটি ছয়শো বছর ফারসী রাজভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। দিল্লী সাম্রাজ্যের সীমা ক্রমশ বাড়তে থাকে, ভারতের সেই সকল প্রদেশের ভাষাকে আরো পল্লবিত করার সুযোগ বেড়ে যায়, যা দিল্লী থেকে দূরে ছিল।

যে মুসলমান জাতি অষ্টম শতাব্দীতে সিন্ধু-র উপর আক্রমণ করে তারা আরবের অধিবাসী ছিল। তাদের ভাষা আরবী ছিল। সিন্ধে বিদ্রোহ হয় এবং রাজসত্ত্বার অবসান ঘটানো হয়। একাদশ শতাব্দীতে মহমুদ গজনবী ভারতের উপর আক্রমণ চালান, তিনি তুর্কী ছিলেন। বাবরের মাতৃভাষা তুর্কী ছিল। তিনি তাঁর আত্মকথা ফারসী নয়, তুকী ভাষায় লিখেছিলেন। শেরশাহ পাঠান ছিলেন। ভারতে যেসকল মুসলমান আক্রমক রূপে আসেন, তারা মূলত তুর্কী ছিলেন। সেই কারণে এখানকার ভাষায় তুর্কী শব্দের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু উর্দু বা অন্য ভারতীয় ভাষার উপর তুর্কীর প্রভাব খুবই কম। পাঠানদের ভাষা পোস্ত ছিল; এই ভাষার প্রভাব উর্দু ভাষায় নেই বললেই চলে। বহিরাগত মুসলমানগণের প্রত্যেকের ভাষা এক ছিল না; তাদের সাংস্কৃতিক স্তরও এক ছিল না।

ভারতে আগত মুসলমানগণ স্বয়ং জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক উৎপীড়নের শিকার হয়েছিলেন।

সেই সময় শাসন ছিল তুর্কীর কিন্তু রাজভাষা ছিল ফারসী। পাঠানগণ দিল্লীতে রাজত্ব করে কিন্তু দিল্লী ও আফগানিস্তান উভয় স্থানেরই রাজভাষা ছিল ফারসী। ফারসীর এই আধিপত্যের কারণে তুর্কী, পোস্ত ইত্যাদি ভাষার আপন সত্ত্ব লাভ হয়নি, তাদের নিজ প্রদেশে রাজভাষার গৌরবপদ মেলেনি। এ সম্পর্কে সৈয়দ এহতিশাম হুসেন বলেন—"জো মুসলমান ইহা আয়ে বে তুর্কী, আরবী, ফারসী অর দুসরী মধ্য এশিয়াই ভাষায়ঁ বোলতে থে, কিন্তু উনকে সাহিত্যিক অর সাংস্কৃতিক ব্যবহার কা মাধ্যম ফারসী থী।"[১২]

উর্দুর প্রারম্ভিক সময়ে যে আরবী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে, তার মাধ্যম ছিল ফারসী। ফারসী রাজভাষা হওয়ায় অপ্রত্যক্ষরূপে আরবী ও হিন্দী তথা অন্য ভারতীয় ভাষাকে প্রভাবিত করে। ফারসী একমাত্র রাজভাষা হয় আকবরের শাসনকালে, তার পূর্বে রাজভাষা থাকলেও রাজ্যের বেশিরভাগ কাজ হিন্দীতেই হতো। কিন্তু আকবরের সময়েও হিন্দী ভাষার প্রচলন পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। বাবরের ভাষা তুর্ক ছিল। অন্যদিকে মুঘল বাদশাহের ভাষা হিন্দী নয়, ফারসী ছিল কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না যে দিল্লীর প্রায় সব মুসলমানদের ভাষাই হিন্দী ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে মুহম্মদ তুঘলক স্থির করেন যে দেশের রাজধানী দিল্লীর পরিবর্তে দেবগিরিতে স্থাপিত হবে। সেই কারণে দিল্লীবাসীদের শহর ছেড়ে দক্ষিণদিকে যাওয়ার অনুমতি দেন। কিন্তু রাজধানী আবার দিল্লীতে ফিরে এলে যারা দক্ষিণে চলে গিয়েছিল তারা সেখানেই থেকে গেল। চতুর্দশ শতাব্দীতে এই দিল্লীনিবাসীদের কেন্দ্র করেই বাহমনী সাম্রাজ্যের স্থাপনা হয়েছিল। এ সম্পর্কে সৈয়দ এহতিশাম হুসেন জানান—"উত্তরী ভারত ঈরানী অর আরবী সংস্কৃতি সে প্রভাবিত থা, পর দক্ষিণ ইস সে বহত কুছ মুক্ত থা, ইসী লিএ য়ঁহা এক আর্য ভাষা কো বিকাশ কা অচ্ছা অবসর মিলা। অগর প্রসিদ্ধ ইতিহাস 'তারীখে ফিরিস্তা' কী বাত ঠিক মানী জায় তো য়হ মাননা পড়েগা কি বাহমনী বাদশাহকে রাজ কার্যলয়োঁ মেঁ হিসাব কিতাব হিন্দী ভাষাঁ মেঁ রখা জাতা থা। ইসকা অর্থ য়হ হুয়া কি ২৪বী কা অন্ত/ হোতে হোতে বহাঁ উর্দু ভাষা প্রচলিত হো গয়ী থী।"[১৩]

একথা সত্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে উর্দু ভাষার বিকাশ হয়েছিল, তা পূর্বের তুলনায় ভিন্ন ছিল। পরবর্তীকালের উর্দু ভাষায় হিন্দী শব্দের প্রাধান্য দূরীভূত হয়ে ফারসী শব্দের বাহুল্য লক্ষিত হয়। মুঘল রাজ্যের পতনকালে উর্দুর রাজাশ্রয় প্রাপ্ত হয়। উর্দুকে মাধ্যম করে যে সাহিত্য গড়ে ওঠে তার সামাজিক আধার খুবই সঙ্কুচিত ছিল। এটি সামন্তকালের পতনের যুগ ছিল। আর সাহিত্যকলা বাদশাহ আমিরদের হস্তগত ছিল। এই পতনকালে জনতার ভাষা উর্দুকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ মেলে।

মুঘল রাজত্বকালে উত্তর দক্ষিণ ভারতের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং হিন্দুস্থানী বা উর্দুভাষার

প্রসার সম্পর্কে বলা হয় যে সপ্তদশ শতাব্দীতে বিশেষত ঔরঙ্গজেবের সৈন্য অভিযানের সময়, উত্তর-দক্ষিণ ভারতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কায়েম হয়। দক্ষিণে যে কথ্য ভাষা প্রচলিত ছিল, উত্তর ভারতের উপনিবেশে ভাষার সেই রূপ প্রথম থেকেই প্রচলিত ছিল এবং ক্রমশ প্রসারিত ও সুগঠিত হচ্ছিল। মুঘল রাজধানীর ভাষা দক্ষিণে পৌঁছনোর আগে যে ভাষা সেখান ব্যবহৃত হতে থাকে, তা হায়দ্রাবাদ, উত্তরী কর্ণাটকে এখনো হিন্দুস্থানীর দক্ষিণী রূপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভাষাবিদ্‌দের মতে 'উর্দু-এ-মুঅল্লা' নামের ব্যবহার সম্ভবতপ্রথম দক্ষিণে হয়েছিল।

মোটামুটি ১০০০ ইং-এর কাছাকাছি কোনো সময়ে ভারতীয় আর্য ভাষার এক নতুন যুগ 'নব্যভারতীয় আর্যভাষা'র কাল আরম্ভ হয়। এক নব যুগের সূচনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি অবাধ গতি সঞ্চার করতে শুরু করে। এই পর্বে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এক উজ্জ্বল বিচারধারা, ভাষার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার এক সৃজনী পরম্পরার পরিচয় মেলে। আর্যভাষার বৈদিক, সংস্কৃত, পালি এবং প্রাকৃত রূপে এবং অন্যদিকে দ্রাবিড় ভাষার তামিল, কন্নড় ইত্যাদি রূপে বিশুদ্ধ সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির উপর উচ্চকোটির গ্রন্থের নির্মাণ এই সময় হতে থাকে।

ভারতীয় আর্যভাষা তথা সংস্কৃতির উপর ফারসী ভাষা (আরবীমিশ্রিত ফারসী ভাষা)। তার আধিপত্য কায়েম করে। তুর্কী বিজেতাদের বিজয়ী মুসলমানের সাংস্কৃতিক ভাষারূপে ফারসীর আগমন ঘটে। পরবর্তীকালে তা ভারতীয় মুসলমানগণেরও সাংস্কৃতিক ভাষা হয়ে ওঠে। ফারসী প্রথমে মুসলমান বাদশাহের রাজভাষা এবং আইনানুসারে ন্যায়দানের মান্যভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আকবরের অর্থমন্ত্রী এক হিন্দু রাজা টোডরমলের পরামর্শ অনুসারে রাজস্ব বিভাগে প্রচলিত হিন্দী বা অন্যভাষার স্থানে ফারসীকে স্থান দেওয়া হয়। এর ফলস্বরূপ সরকারী চাকুরী লাভের আকাঙ্ক্ষায় অনেক হিন্দুও তখন ফারসী ভাষা শিখতে আগ্রহী হয়। আর তার ফলেই ফারসী মিশ্রিত হিন্দীর এক নতুন রূপ 'উর্দু'র বিকাশ সম্ভব হয় এবং তার প্রসারও শীঘ্রতর হয়। তবে ভারতীয় আর্যভাষার শব্দাবলীর ফারসীকরণ প্রত্যক্ষভাবে অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই আরম্ভ হয়।

কেউ কেউ মনে করেন উর্দু ভাষার জন্ম ফারসী ভাষা থেকে হয়েছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন ব্রজভাষা থেকে এই ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কোনো ভাষায় অন্য একটি ভাষার শব্দাবলীর আধিক্য হেতু এমন মনে করা যুক্তিসংগত নয় যে ভাষাটি সেই ভাষা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। আসলে উর্দু ভাষাকে পশ্চিমী হিন্দীর সেই শ্রেণীর ভাষা বলা যায়, যার সম্পর্ক ফারসী ও আরবী ভাষার সঙ্গে অধিক আছে। এর আসল রূপ খড়ীবোলীর, তাতে

আরবী ফারসীর আদব-কায়দা এমনভাবে আরোপিত যে বাইরে থেকে একে বিদেশী ভাষা বলে মনে হয়।

তুর্কী ভাষায় লস্কর বাজারকে 'উর্দু' বলা হতো। ইসলামী শাসনকালে মুঘল, পাঠান, তুর্ক, আফগান ইত্যাদি বিদেশী সিপাহী বাদশাহী ফৌজে চাকরী করতো। সেই সময় লস্কর বাজারে লেন-দেন, কেনা-বেচার ক্ষেত্রে তাদের আবরী ফারসী বা তুর্কী কোনো স্বতন্ত্র ভাষাকে ছেড়ে এমন ভাষায় কথা বলতে হোত, যা এখানকার লোক সহজেই বোঝে। অর্থাৎ এই সময় সব ভাষার মিশ্রণে একটি স্বতন্ত্র ভাষার সৃষ্টি হয় এবং তারই পরবর্তীতে 'উদু' নাম হয়। আর যেহেতু এই ভাষায় বিভিন্ন ভাষার শব্দ প্রযুক্ত হতে দেখা যায়, তাই একে 'রেখ্‌তা' (বিখরী হুয়ী/ছড়ানো)ও বলা হয়। আবার অনেক ভাষাতত্ত্ববিদের মতে, উত্তর ভারতের বিজয়ী শাসকগণ তাদের সাথে দিল্লী এবং মেরঠের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ব্যবহৃত খড়ীবোলী হিন্দীকে দক্ষিণে নিয়ে যান, তার উপর সেখানে এই ভাষার এতটাই সংস্কারসাধন হয়েছে যে তা খড়ীবোলী রূপে না থেকে দক্ষিণী হিন্দীর রূপ পরিগ্রহ করে। একেই 'দক্‌নী বা 'উদু' বলা হয়। 'উর্দু'র উৎপত্তি 'ওর্দ' নামক তুর্কী শব্দ থেকে হয়েছে, যার অর্থ 'ছাউনী'।

উর্দু ভাষা 'হিন্দবী' তথা 'হিন্দোস্থানী' অনেক নামে প্রথমে প্রচলিত ছিল। এতে আরবী, ফারসী, তুর্কী এবং বর্তমানে ইংরেজী শব্দও যুক্ত হয়েছে। ১২৫৫ ইং, আমীর খসরু, খালিক বারি এবং তাঁর বন্ধু খাজা সৈয়দ আশরফ ১৩০৮ সালে 'ইয়লাক্ব ব তস্‌সুফ' (পহলী উদু/প্রথম উর্দু) গ্রন্থ লেখেন। ১৮৩৫ সালে সমস্ত দফতরে উর্দু প্রচলিত হয়। সকল সরকারি দফতর উর্দুকে প্রাধান্য দেয়। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হওয়ার পূর্বেই অন্য ইউরোপীয়ানরা হিন্দুস্থানী তথা উর্দু ভাষার মহত্ব উপলব্ধি করেন এবং এর উপর ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য লেখক গিলক্রিস্ট ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রায় ২০ বৎসর উর্দু ভাষা সম্পর্কে লেখেন। হিন্দুস্থানী ভাষার জ্ঞানী-প্রাজ্ঞ হিসেবে তাঁকে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হিন্দুস্থানী ভাষার প্রফেসর নিযুক্ত করা হয়। গিলক্রিষ্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন; ১৮৮৩ সালে তিনি ভারতে আসেন এবং হিন্দুস্থানী ভায়ার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি কথ্য ভাষা, ব্যাকরণ, শব্দকোষ ইংরাজী এবং উর্দু ভাষায় অনেক গ্রন্থ লেখেন। ১৮০৪ সালে দেশে ফিরে কোম্পানীর সেই সকল কর্মচারীকে উর্দু ভাষা সেখান, যাদের ভারতে পাঠান হতো।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ভারতের বৃহৎ অংশে ইংরেজ প্রভুত্ব কায়েম হয়। ইংরেজদের এদেশে রাজত্ব করার সুবিধার্থে এখানকার ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক ছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্দেশ্য ছিল নতুন ইংরেজ কর্মচারীদের ভারতীয় ভাষায় শিক্ষিত করা। উর্দু ভাষার

ক্ষেত্রে লক্ষণীয়, ইংরেজ সেই সময় পর্যন্ত ফারসী ভাষা শিখত, কারণ ফারসী রাজভাষা ছিল। কিন্তু যখন তারা দেখে সারা দেশে হিন্দুস্থানী প্রচলিত, তখন তারা ফারসী ছেড়ে উর্দুর উপর নজর দেয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকগণের মধ্যে মীর আম্মনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই কলেজের অন্যান্য লেখকদের মধ্যে মীর শের আলী, মীর্জা আলী 'লূত্‌ফ', মজহর আলী খাঁ, নিহাল চন্দ, মির্জা কাজিম প্রমুখ উর্দু গদ্য ও পদ্যের বিকাশ ঘটান। তাছাড়া ১৮৪২ সালে দিল্লীতে একটি উর্দু সোসাইটি স্থাপিত হয়; যেখানে অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে শব্দকোষও প্রকাশিত হয়। এইভাবে উর্দু ভাষা ভারতীয় অন্যান্য ভাষার সঙ্গে সমমর্যাদায় গৃহীত হতে থাকে।

অনেক ভাষাবিজ্ঞানী ভারতকে 'ভাষার জাদুঘর' বলে অভিহিত করেছেন। গ্রিয়র্সনের মতে এখানে ১৭৯টি ভাষা এবং ৫৪৪টি কথ্য ভাষা বা বোলী প্রচলিত। উর্দু ভাষার ইতিহাস ভারতের হাজার বছরের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই সময় সে সকল ভাষার বিকাশ হয় সেগুলি ভারতের সামাজিক তট পরিবর্তনের প্রভাবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই তট পরিবর্তনের কালেই ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাসে উর্দু ভাষার জন্ম হয়। সুতরাং বলা যায় উর্দু ভাষার জন্ম সামাজিক আবশ্যকতার স্তর থেকেই হয়েছে। পরবর্তীতে সাংস্কৃতিক বিচার ধারা এবং সাহিত্য কৃতি এর মধ্যে সন্নিবেশিত হয়ে একে এমন এক পরিশীলিত রূপ দান করে যে উর্দু ভারতীয় ভাষার ইতিহাসে এক ভিন্ন মাত্রিক স্থান অধিকার করে। উর্দু ভাষা ধীরে ধীরে এমন এক স্তরে উন্নীত হয় যে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক বিদ্যান একে 'হিন্দুস্তানী' রূপে দেশের 'জনভাষার' সংজ্ঞা প্রদান করেন। কোনো ভাষার পরিবর্তন তার ব্যবহারিক স্তর থেকেই হয়ে থাকে। এই পরিবর্তন সামাজিক চেতনা তথা অন্য ভাষার সঙ্গে আদান-প্রদানের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। আর ভারতে সেই আদান-প্রদানের সুযোগ অনেক বেশী, কারণ ভারতে বহু ভাষাভাষী মানুষের সহাবস্থান ঘটেছে।

১০০০ ইং-এর আশেপাশে মুসলমানগণ পাঞ্জাবের বড় অংশকে নিজেদের অধীনস্থ করে নেয়। মহম্মদ ঘোরীর রাজত্ব স্থাপন পর্যন্ত গজনবী বংশ রাজত্ব করে। মহম্মদ ঘোরীর রাজত্বকালে রাজ্যের সীমা পাঞ্জাব থেকে ছাড়িয়ে মধ্যভারত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ১২০৬ ইং গুলাম বংশ তাঁর রাজ্য স্থাপন করেন। এই সময় মধ্য এশিয়ায় চেঙ্গীস খাঁর অত্যাচারে বহু ইরানী ভারতে পালিয়ে আসেন। অতঃপর খিলজী বংশ স্থাপিত হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে রাজ্যের সীমা পূর্বে বাংলা পর্যন্ত এবং দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। মালিক কাফুরের বিজয়ী আক্রমণ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতকে সংগঠিত করে এবং বাহ্যিক রূপে সারা দেশ এক কেন্দ্রে স্থাপিত হয়। তুঘলকের রাজত্বকালে ১৩২৭ সালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাঁর রাজধানী দিল্লী থেকে দক্ষিণ ভারতের দেবগিরিতে স্থানান্তরিত করা হবে এবং সমগ্র

দিল্লীবাসীকে সেখানে যেতে আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু বছরের মধ্যেই তাদের আবার ফিরে আসার হুকুম দেওয়া হয়। কিন্তু তখন বহু মানুষ সেখানে থেকে যান। উর্দুর উদ্ভবের ইতিহাসে এই ঘটনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লীকে কেন্দ্র করে বহু বংশের বাদশাহ ভারতে রাজত্ব করেন। এরপর ষোড়শ শতাব্দীতে মুঘল শাসনের মাধ্যমে ভারতে আবার একবার সবল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় দু'শো বছর রাজত্ব করার পর মুঘলদের পতন ঘটতে থাকে এবং সাথে সাথে মারাঠা, শিখ এবং সর্বাপেক্ষা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উত্থান ঘটতে থাকে।

এই ঐতিহাসিক পটভূমিতেই উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ সাধিত হতে থাকে। পাঞ্জাবে গজনবী বাদশাহের রাজত্বকালে সংস্কৃতির বিশেষ আদান প্রদান ঘটে। মহম্মদ গজনবী বিদ্যাপ্রেমী ছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষার মহত্ত্বকে স্বীকার করেছেন। এই সময় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ আরবী ফারসী ভাষায় হয়েছিল। তখনকার অনেক বড় বড় কবিদের রচনায় এক-আধ শব্দ ভারতের ভাষার মিলে যায়। পাশাপাশি হিন্দু মুসলমানদের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে সাহিত্য ক্ষেত্রও আরও সুদৃঢ় হতে থাকে। যখন দিল্লী রাজধানী হয় তখন এই আদান প্রদানের আবশ্যকতা আরো বৃদ্ধি পায় এবং ভাষিক ঘনিষ্ঠতার কেন্দ্র পাঞ্জাব থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানকার ভাষায় সংমিশ্রিত হতে থাকে। এ থেকে মনে হয় হিন্দু ও মুসলমানের মিলনে ভারতবর্ষের নবীন আর্যভাষা বিশেষভাবে প্রভাবিত হচ্ছিল এবং যেমন একদিকে রাজস্থানী, ব্রজ ও অবধি ভাষার বিকাশ সাধিত হচ্ছিল, তেমনি অন্যদিকে উর্দু ভাষা ভারতের ভূমিতে তার শিকড় বিস্তার করছিল। উত্তর ভারতে এই ভাষার সৃষ্টি হলেও তেমনভাবে সাহিত্যে রূপ পায়নি। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে একে সাহিত্যেও প্রযুক্ত করা হয়।

প্রারম্ভিক ইতিহাসে উর্দু নামের উল্লেখ মেলে না। প্রারম্ভিককালে যারা ফারসী ভাষায় ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখেন এবং যারা পাঞ্জাব, উত্তর ভারত, গুজরাট সফরে এসে তাদের যাত্রার বিবরণ লেখেন তাঁরা এখানকার ভাষাকে 'জবানে হিন্দ', বা 'হিন্দুই' বলে অভিহিত করেন। আমির খুসরো ভারতের ভাষার বর্ণনা করতে গিয়ে তাকে 'হিন্দী' 'হিন্দুই' এবং 'জবানে-দেহলী' বলেও উল্লেখ করেছেন। মুহম্মদ তুঘলক ও ফিরোজ তুঘলকের রাজত্বকালে ইতিহাসের যে গ্রন্থ রচিত হয়, সেখানে উত্তর ভারতের বোলচালের ভাষাকে 'হিন্দুই' বলা হয়। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে দক্ষিণে তাকে 'জবানে হিন্দুস্তান', অথবা 'হিন্দুস্তানী' বলা হয়। কখনো কখনো একে 'দকনী' ও বলা হয়। আবুল ফজল তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আইনে আকবরী'-তে 'হিন্দুই' শব্দের প্রয়োগ করেন। গুজরাতে একে 'হিন্দী' বা 'হিন্দুই' এবং 'গুজরী' তিন নামেই অভিহিত করা হয়। মোটামুটি ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্ত পর্যন্ত 'উর্দু' শব্দের প্রয়োগ কোনো স্বতন্ত্র ভাষা অর্থে মেলে না। তার স্থানে 'রেখতা' বা 'হিন্দী' দুটি শব্দই

কবিদের কলমে ছিল। 'রেখতা' সংগীতের একটি বিশেষ পারিভাষিক শব্দ। অধিকতর পদ্যের ক্ষেত্রে এই শব্দ ব্যবহৃত হতো এবং গদ্যের ক্ষেত্রে 'হিন্দী' শব্দই ব্যবহৃত হতো। এইভাবে বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন সময়ে উর্দুর বিভিন্ন নাম মেলে।

ভাষাবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে যদি চতুর্দশ শতাব্দীতে বাহমনী রাজ্যের মতো দিল্লী রাজ্যের রাজভাষা হিন্দী হতো তাহলে দেশের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস অন্যরকম হতো। তুর্ক এবং মুগল রাজভাষার সামাজিক আধার খুব সীমিত ছিল। এই রাজসত্তায় কৃষক কারিগর ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষ অত্যন্ত পীড়িত ছিল, সামন্তগণও অসন্তুষ্ট ছিল। এরকম পরিস্থিতিতে ফারসীকে রাজভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ায় সেই রাজসত্তা তার সঙ্কুচিত সামাজিক আধারে সুরক্ষিত থাকত। ফারসী হিন্দু বা মুসলমান কারোরই কথ্য ভাষা ছিল না। একে হিন্দুও শিখত, মুসলমানও।

দক্ষিণের সমস্যা ছিল ভিন্ন। রাজ্যের অধিকাংশ প্রজা হিন্দীভাষী ছিল না। তাদের ভাষা তেলুগু বা মারাঠী ছিল। এই তেলুগু বা মারাঠীভাষীদের উপর রাজভাষা হিন্দীর আরোপ ঘটানো হলো। দক্ষিণে হিন্দুস্থানী জাতি উৎপীড়ক জাতির ভূমিকা গ্রহণ করে। রাজ্যের অধিকাংশ সাধারণ প্রজা এই রাজভাষা চায়নি। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ফারসীকে রাজভাষা করার ক্ষেত্রে আগ্রহী বাহমনী বাদশাহগণ অধিক প্রগতিশীল ছিল। ফারসী অপেক্ষা হিন্দী বুঝতে ও বলতে পারা জনগণের সংখ্যা অধিক ছিল। তাছাড়া তেলুগু ও মারাঠীভাষীরা ফারসী অপেক্ষা হিন্দী ভাষা তাড়াতাড়ি শিখতে পারত।

বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন বিভিন্ন ভাষা ব্যবহারকারী মানুষের পরস্পর সম্মিলনে 'হিন্দুস্থানী'র বিকাশ হয়েছে; তবে যে কথ্য ভাষা থেকে এতে বহু তত্ত্ব এসেছে এবং যাদের সঙ্গে সম্পর্কের ভাষা হয়েছে, সেই কথ্য পাঞ্জাব, রাজস্থান, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও পূর্বীসমুদায়ের ভাষাও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। বিভিন্ন জনপদের মধ্যে সম্পর্কের সামাজিক আবশ্যকতাকে এই ভাষা পূরণ করেছিল। এমনকি বলা যায় এই হিন্দুস্থানী বা উর্দু ভাষা ব্রজ, অবধি, ভোজপুরী, মাড়োয়াড়ি ইত্যাদি ভাষার উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি।

ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় 'ইন্ডিয়ান লিঙ্গুইস্টিক' (১৯৩১, খণ্ড-১, ভাগ ২-৪)-এ কোলকাতার হিন্দুস্থানীর উপর একটি রচনা প্রকাশ করেন 'ক্যালকাটা হিন্দুস্থানী-এ স্টাডি অফ এ জার্গন ডায়লেক্ট' নামে; সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে তুর্ক এবং পাঠান শাসনের প্রারম্ভিক কালে হিন্দুস্থানীর রূপ খুব অসংগঠিত ছিল। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতেই তা পুরনো রূপে, ব্রজভাষা ও অবধির সাথে সাথে পাঞ্জাব থেকে শুরু করে বিহার পর্যন্ত সাহিত্যে প্রযুক্ত হতে থাকে। কবীরের ভাষা পুরনো হিন্দুস্থানী ছিল, আর এটাই ছিল আদিগ্রন্থের ভাষা। তাঁর

মতে উত্তর ভারতের সিপাহী যখন দক্ষিণ ভারতে যেত, তখন সেখানে নিজেকে সম্পূর্ণ অচেনা জগতে পেত, সেখানে মারাঠী, তেলুগু, কন্নড় ও তামিল ভাষা প্রচলিত ছিল। যারা উত্তর থেকে দক্ষিণে থেকে গেলেন তারা ষোড়শ শতাব্দীর হিন্দুস্থানী সাহিত্যকে রূপদান করলেন। গোলকুণ্ডার সুলতান কুতুবশাহ প্রমুখ উর্দু সাহিত্যের জন্ম দিয়েছেন। আর দিল্লীর আমির মুশরো অপেক্ষা তারা উর্দুর বাস্তবিক আদি নির্মাতা ছিলেন।

দিল্লী উত্তরী ভারতের মধ্যে এমন এক স্থানে অবস্থিত, যেখানে শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে উৎপন্ন বহু ভাষা এসে মেশে। এই সকল ভাষা পৃথক পৃথক হয়েও মূলগত দিক থেকে একই ছিল। দিল্লীর একদিকে ছিল হরিয়ানী, অন্যদিকে খড়িবোলী, পশ্চিমে পাঞ্জাবী, দক্ষিণ-পূর্বে ব্রজভাষা। এই সকল ভাষায় প্রথমাবস্থায় কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচিত না হলেও পরবর্তীতে বেশ কিছু সাহিত্য রচিত হয়। কিন্তু খড়িবোলী কেবল কথ্য ভাষা হিসেবেই থেকে যায়। তার কারণ উচ্চবর্গের লোক তাদের কাজে ফারসী ভাষার ব্যবহার করত। এরপর খড়িবোলীতে আরবী-ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। এই খড়িবোলীর পরিবর্তনের দ্বারা সেই ভাষার সৃষ্টি হয়, যাকে সাধারণত 'হিন্দুস্থানী' বলা হয়। এই 'হিন্দুস্থানী'র দুটি সাহিত্যিক রূপের কথা বলেছেন ভাষাবিজ্ঞানীগণ—(১) হিন্দী, যেখানে সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য লক্ষ করা যায় এবং এটি দেবনাগরী লিপিতে লেখা হয়। (২) উর্দু, যেখানে আরবী ফারসী শব্দের বাহুল্য লক্ষ করা যায় এবং একে ফারসী লিপিতে লেখা হয়। সৈয়দ এহতিশাম হুসেম বলেন—"উর্দু এক আর্য়-ভাষা হ্যয়, জো খড়িবোলী, শৌরসেনী অপভ্রংশ, শৌরসেনী প্রাকৃতকে অন্তর হো কর বোল-চাল কী উস ভাষা সে সম্বন্ধ জোড়তী হ্যায়, জো সংস্কৃতকে সাথ-সাথ বোলী জানেবালী প্রাকৃতিক বোলিয়োঁকে রূপ মে অব সে ঢাঈ হজার বর্ষ পূর্ব জীবিত অর প্রচলিত থী। ঐতিহাসিক কারণোঁ সে অপনী আবশ্যকতাওঁ কে অনুসার উসনে ফারসী অরবী অর সংস্কৃত কী শব্দাবলী সে ভী কাম লিয়া। ইসকা মূল আধার খড়ীবোলী হ্যয়, কিন্তু এক জীবিত ভাষা হোনে কে কারণ উসমে উন সভী ভাষাওঁকে শব্দ আগয়ে হ্যয়, জিসসে উসকা সম্পর্ক রহা হ্যয়।"[১৪]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে ইতিহাস তার গতি পরিবর্তন করে। পূর্বেই উল্লিখিত মুঘলদের দুর্বলতার সুযোগে আর এক নতুন শক্তি এদেশে তার প্রভুত্ব বিস্তার করতে আরম্ভ করে; যা জায়গিরদারী প্রথার উপর আধারিত ছিল। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের কূটনীতির মোকাবিলা করতে ভারতের ভ্রষ্ট রাজা এবং ধনীরা সক্ষম হয়নি। ব্রিটিশ রাজশক্তির বিছানো জালে জনজীবন মূলকেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। দেশে তখন সুজাউদৌল্লা, আলিবর্দি খাঁ, হৈদর আলী, মারাঠা, নিজাম, মুঘল, রাজপুত, শিখ, জাট ইত্যাদি রাজশক্তি কায়েম থাকলেও তারা কখনোই কোন উদ্দেশ্যে একমত হতে পারেনি। বরং একে অপরের

সঙ্গে যুদ্ধ করে দুর্বল হতে থাকে, কিম্বা ইংরেজগণ তাদের পরাস্ত করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম দশকে বাংলা, বিহার, ওড়িসা, মাদ্রাজ ইংরেজদের অধীনস্থ হয়। যে সকল প্রদেশ নামমাত্র স্বাধীন ছিল তারাও কোনো না কোনো ভাবে ইংরেজের আশ্রয়ে ছিল। ইংরেজ এখানে রাজত্বস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এখানকার শিক্ষাব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ আনে, পাশাপাশি এখানকার ভাষার উপর নজর দেয়।

উর্দু ভাষার প্রসারের ক্ষেত্রে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মুসলমান দরবার তথা মুসলমান রাজকর্মচারীর ভূমিকাকে অধিকমাত্রায় গুরুত্ব দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে তিনি বলেন যে বাংলার মুসলমান শাসকগণ বাংলা সাহিত্যের বিকাশকে উৎসাহিত করেছিল। তাদের ভাষা বাংলা ছিল, হিন্দুস্থানী নয়। তারা হিন্দুস্থানীও জানত, কিন্তু তেমনভাবে যেমন ভাবে বহু লোক, বিশেষত ব্যবসায়ী তাকে জানত। বাংলায় 'হিন্দুস্থানী ভাষা' 'সম্পর্কের ভাষা' হিসেবে বিস্তার লাভ করে। ইংরেজ রাজ কায়েম হওয়ার আগেই তা ছিল ইংরেজ রাজ কায়েম হওয়ার পরও সেই প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

বাংলায় হিন্দুস্থানী ভাষার প্রসার সম্পর্কে ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় জানান যে, দরবার থেকে এই ভাষা সাধারণ জনগণের মধ্যে ছড়াতে থাকে। পাশাপাশি বিভিন্ন সুবায় এই ভাষা প্রসারের সুযোগ মেলে। যে সকল বাঙালি সেই সময় সরকারী চাকরী করতে আগ্রহী ছিল, তাদের সবার আগে ফারসী ভাষা শিখতে হতো। পাশাপাশি তাদের হিন্দুস্থানীও শিখতে হতো। উত্তর ভারত থেকে ছোট ছোট ব্যাপারী, সিপাহী, দারোয়ান, সাধু-সন্ন্যাসী নিরন্তর বাংলায় আসত। এরা বাংলায় উর্দুর স্থিতিকে আরো মজবুত করে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ যখন কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করে, তখন বাংলার জন্য হিন্দুস্থানীকে অনিবার্য ভাষা মেনে, তারা হিন্দুস্থানী শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থানীর প্রফেসর নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। হিন্দুস্থানী তথা উর্দুর প্রসারের ক্ষেত্রে ভাষাবিজ্ঞানীগণ লক্ষ করেন যে, রাজপুতানা, পাঞ্জাব থেকে বরাবর লোক বাংলায় আসতে থাকেন, এদের মধ্যে মজদুর ও ব্যাপারীও ছিল। তাই বাংলার বড় শহরে বিশেষত কোলকাতায় বাঙালীদের উর্দুর সঙ্গে পরিচিত হতেই হতো। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় কোলকাতাকে 'দ্বিভাষী নগর' বলেছেন, যার দুটি মুখ্য ভাষা—বাংলা এবং হিন্দুস্থানী।

সমাজের প্রত্যেক অবস্থায় ভাষা তার সংস্কৃতিকে প্রতিবিম্বিত করে। সংস্কৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে ভাষাতেও পরিবর্তন সাধিত হয়, কেননা ভাষা পক্ষান্তরে সংস্কৃতিরই অঙ্গ। ভাষা বিকাশ দুই স্তরে হয়ে থাকে। একস্তরে অন্য ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে, অন্য ভাষার সঙ্গে আদান-প্রদানে শব্দভাণ্ডার সুদৃঢ় হয়; ভাষার প্রয়োগের পরিধি বিস্তৃত হয়। একে

ভাষাবিজ্ঞানীগণ 'ভাষার রূপ সম্বন্ধী বিকাশ' বলেছেন। অন্যদিকে যখন সামাজিক, সাংস্কৃতিক আবশ্যকতার অনুরূপ তার অভিব্যঞ্জনা ক্ষমতা বদলায়, তখন তা এক নতুন স্তরের সংস্কৃতিকে প্রতিবিম্বিত করে। একে ভাষাবিজ্ঞানীগণ 'ভাষার বিষয়বস্তু সম্বন্ধী বিকাশ' বলেছেন। এই দুই শ্রেণীর বিকাশই সামাজিক কারণে হয়ে থাকে। বাহ্য অন্তর্বিরোধের দ্বারা সাধারণত ভাষার রূপ সম্বন্ধী পরিবর্তন সাধিত হয় আর সমাজের নিজ অন্তর্বিরোধ থেকে বিষয়বস্তু সম্বন্ধী পরিবর্তন সাধিত হয়. এই দুই শ্রেণীর অন্তর্বিরোধ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

বাংলায় জাতীয় জনপদ নির্মাণের ক্ষেত্রে ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে হিন্দী প্রদেশের মতো বাংলাও বিভিন্ন জনপদে বিভাজিত ছিল। ড. সুনীতি কুমার তাদের রাঢ়, পুন্ড্র অথবা বরেন্দ্র ও কামরূপ নামে অভিহিত করেছেন। এই সকল জনপদের একীকরণের কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে ভাষায় বিভিন্নতা সত্ত্বেও সামাজিক তথা রাজনৈতিক কারণে এরা একত্র হয়। জাতীয় ভাষার সহজ প্রসারও একইভাবে হয়ে থাকে। বিভিন্ন জনপদীয় ভাষা এই জাতীয় মাধ্যমকে প্রভাবিত করে। সংস্কৃতির উপর আভিজাতবর্গের প্রাধান্য নষ্ট হয়। জাতীয় জীবন নতুন উদ্যমে বয়ে চলে।

ভারতীয় আর্যভাষা দুইভাবে প্রসার লাভ করেছিল। একদিকে কথ্য ভাষার সীমা ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ধার্মিক ও উচ্চ-বৌদ্ধিক জীবনের ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। আর্যভাষা যত দেশের কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করতে থাকে, ততই তার ধ্বনিতত্ত্বে শীঘ্রই পরিবর্তন ঘটতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে তা অনার্যভাষার রীতিকেও আত্মসাৎ করে। শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রাচীন বৈদিক শব্দের স্থানে কথ্য ভাষার শব্দও প্রযুক্ত হতে থাকে। সংস্কৃত ভাষায় এক সতত বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। পাণিনির সময় 'লৌকিক' বা প্রচলিত সংস্কৃতের ভারতীয় আর্য-প্রাদেশিক ভাষায় সম্ভবত সেই স্থান ছিল, যা আধুনিক কালে হিন্দী বা হিন্দুস্থানীর আছে।

তাই একথা বলাই যায় যে আর্যজাতির আগমনে ভারতের ভাষার ইতিহাসে বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়। বৈদিক সংস্কৃতির মহত্ত্ব প্রাপ্তি হয়। ভারতে আর্যজাতি সমাজে মানুষকে এমনভাবে বর্ণে বিভাজিত করেছিল যে উচ্চজাতির ভাষায় এবং নিম্ন শ্রেণীর মানুষের ভাষায় বিস্তর অন্তর ঘটেছিল। প্রাচীন সংস্কৃত নাটক লক্ষ করলে দেখা যায় ব্রাহ্মর্ণ রাজা ও মন্ত্রীর সংলাপে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হয়। পাশাপাশি নিম্নবর্ণের জনগণ এবং স্ত্রীলোকের সংলাপে প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হয়। ব্রাহ্মণবাদী সভ্যতা যতই ধার্মিক বন্ধনে নিজেকে জড়াতে থাকে এবং তাদের ভাষাকে উন্নত করার অভিপ্রায়ে শুদ্ধ উচ্চারণ ও ব্যাকরণের দিকে নজর দিতে থাকে, ততই নিম্নশ্রেণীর লোক তার থেকে দূরে সরতে থাকে। কিন্তু যখন ভারতীয় সমাজে

ধর্মীয় পরিবর্তন সাধিত হয় এবং বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের সূচনা ঘটে তখন দ্বিতীয়বার ভারতীয় ভাষার ইতিহাসে মহত্ত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে, যাকে 'ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যকালীন যুগ' বলে অভিহিত করেছেন ভাষাবিজ্ঞানীগণ। এক্ষেত্রে উল্লেখনীয় এই সময় সংস্কৃত ভাষার অতিরিক্ত প্রাকৃত ভাষা বিস্তারের অবকাশ মেলে। এই যুগে পালি, মাগধী, অর্ধ-মাগধী, শৌরসেনী এবং অন্য ভাষা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তার শিকড় বিস্তার করে।

ভারতীয় আর্যভাষার এই মধ্যকালীন যুগ সমাপ্ত না হতেই আর্যভাষায় আবার কিছু পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং প্রাকৃতে তৎসম শব্দের ব্যবহার কমতে থাকে আর তার স্থানে তদ্ভব শব্দাবলী বিকশিত হতে থাকে। ভাষাবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ একে 'অপভ্রংশের যুগ' বলে থাকেন। ভাষাবিজ্ঞানীগণ এই অপভ্রংশকে ভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বা মধ্যকালীন আধুনিক যুগকে মেলানোর সেতু বলেছেন। ১০০০ ইং-এর নিকটবর্তী সময় একটি নতুন ভাষাসম্বন্ধী আন্দোলন ঘটে যখন ভারতে বহুসংখ্যায় মুসলমান আগমন ঘটতে থাকে। যদিও মুসলমান আগমন বহু আগেই ঘটেছিল কিন্তু দশম শতাব্দীর অন্ত থেকে তার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মহত্ত্ব প্রাপ্তি হয়। তারা যে ভাষা ব্যবহার করত তার প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই এখানকার ভাষায় পড়তে থাকে। তবে একথা স্বীকার্য যে আর্যজাতির উন্নত সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রকে অনেকাংশে দৃঢ় করেছিল। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভারতীয় আর্য়োভাষা তার হিন্দী' গ্রন্থে ভারতীয় সংস্কৃতির নির্মাণের ক্ষেত্রে আর্যজাতির অবদানের কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—"অস্ট্রিক অর দ্রাবিড়োঁ দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতি কা শিলান্যাস হুয়া থা, অর আর্য়োনে উস আধার শিলা পর জিস মিশ্রিত সংস্কৃতিকা নির্মাণ কিয়া, উস সংস্কৃতি কা মাধ্যম, উসকী প্রকাশ ভূমি এবং উসকা প্রতীক য়হী আর্য়োভাষা বনী; আরম্ভ মে সংস্কৃত, পালী, পশ্চিমোত্তরীয় প্রাকৃত (গান্ধারী), অর্ধমাগধী, অপভ্রংশ, আদি রূপোঁ মে, তথা বাদ মে হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী, ওড়িয়া, বাংলা অর নেপালী আদি বিভিন্ন অর্বাচীন ভারতীয় ভাষাওঁকে রূপ মে, ভিন্ন ভিন্ন সময়োঁ এবং প্রদেশোঁ মেঁ ভারতীয় সংস্কৃতিকে সাথ ইস ভাষা কা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বঁধতা গয়া।"[১৫]

১৯৪৯ সালে নাগরী হিন্দীকে ইংরেজীর সঙ্গে সংবিধানে মান্য ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই ধারায় নাগরী হিন্দী এবং উর্দুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাহিত্য এবং ব্যাকরণ গ্রন্থ এমন স্বতন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা জন্ম থেকেই বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানীর বাতাবরণে বিস্তার লাভ করেছে এবং যা জন্ম থেকেই উর্দু ও নাগরীহিন্দীর উচ্চসংস্কারকে আত্মস্থ করেছে। ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে ভাষার এই শিষ্টরূপকেই সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় নাগরী হিন্দী তথা উর্দুর গ্রহণ যোগ্যতা সম্পর্কে বলেন—"হমে অব ইস ভাষাকে গুণো কো দেখতে হুয়ে য়হ আবশ্যক বস্তু মুক্ত কণ্ঠ সে স্বীকৃত করলেনী চাহিএ কি

239342
24 MAY 2012
LIBRARY NBU. DARJEELING

হোনহার এবং হাটবাজার কী আম জনতা কী সহজ হিন্দুস্থানী হী ভারত কী বাস্তবিক রাষ্ট্র ভাষা হ্যায়। য়হ মান্যতা সচ্চে রূপ মে দী গঈ তভী সিদ্ধ হো সকতী হ্যায় জবকি হম ইস সরল রূপকো নিয়মিত স্বরূপ দেকর উসকা প্রয়োগ সুনিশ্চিত তথা সুসংস্কৃত জনো মেঁ প্রচলিত নাগরী হিন্দী তথা শিষ্ট উর্দু কে ব্যাকরণ শুদ্ধ রূপোকে সাথ সাথ এক বিকল্প কী তরহ হোনে দে।"[১৬]

উত্তর ভারতের—রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত পুরাণ, বুদ্ধ, অশোক, বিক্রমাদিত্য, পৃথ্বীরাজ চৌহান, প্রতাপ সিংহ ও আকবরের দেশের প্রতি বঙ্গবাসীর সর্বদাই এক সম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ করা যায়। তাছাড়া উত্তর ভারতের ভাষা ব্রজভাষা এবং হিন্দীকে বাঙালী জাতি সহজভাবেই গ্রহণ করে নেয়। সমগ্র দেশকে একসূত্রে বাঁধার উত্তম শক্তিরূপে হিন্দীকে স্থান দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বাংলার রাষ্ট্রীয় নেতাগণ জাগরুক হন। তাঁরা তাদের রচনাকর্মে এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে উত্তর ভারতের সর্বসাধারণ জনতাকে একসূত্রে বাঁধার মাধ্যম হিসেবে হিন্দী ভাষা ব্যবহার করা আবশ্যক। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় কোলকাতাকে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সহাবস্থানের কারণে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেছেন। এই বিভিন্ন ভাষার মধ্যে উর্দুভাষাকেও জনগণের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি বরং পারস্পরিক সম্পর্কের আবশ্যকতাকে পূর্ণ করবার এটিও একটি বিশিষ্ট মাধ্যম ছিল।

বালমুকুন্দ গুপ্ত হিন্দী এবং উর্দুকে একই ভাষার দুটো রূপ বলে মনে করেন; যাদের মধ্যে লিপি এবং শব্দাবলীর পার্থক্য আছে। তিনি লেখেন—"ইস সময় হিন্দীকে দো রূপ হ্যায়। এক উর্দু দুসরা হিন্দী। দোনোঁ মেঁ কেবল শব্দোঁ কা হী নহী লিপি ভেদ বড়া ভারী পড়া হুয়া হ্যায়। য়দি য়হ ভেদ না হোতা তো দোনোঁ রূপ মিলকর এক হো জাতে। য়দি আদি সে ফারসী লিপিকে স্থান মেঁ দেবনাগরী লিপি রহতী তো য়হ ভেদ হী না হোতা। অব ভী লিপি এক হোনে সে ভেদ মিট সকতা হ্যায়। পর জলদ এয়সা হোনে কী আশা কম হ্যায়।"[১৭]

গ্রিয়ার্সনের মতানুসারে ইংরেজদের প্রেরণায় আধুনিক হিন্দীর জন্ম হয়েছে। ড. গিলক্রাইস্টের প্রেরণায় লাল্লুজী লাল প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'প্রেমসাগর' রচনা করেন; যেখানে হিন্দুদের পারস্পরিক ব্যবহারের জন্য গদ্য ভাষার বিস্তার ঘটে। উক্ত গ্রন্থের গদ্য ভাগ প্রায় উর্দু ভাষায় লেখা; পার্থক্য শুধু এইটুকু ছিল যে যেখানে উর্দু লেখক ফার্সি শব্দ ব্যবহার করতেন সেখানে লাল্লুজী লাল ইন্দো আর্য শব্দ ব্যবহার করেন। গ্রিয়র্সনের মতে টীকা টীপ্পনী ছাড়া ভারতের কোনো ভাষাতেই 'প্রেমসাগর'-এর রচনাকাল পর্যন্ত গদ্য ভাষার বিকাশই হয়নি। লাল্লুজী লালের সময় থেকেই হিন্দী ভাষা নিজস্ব শৈলী নির্মাণ করে, আর সেই কারণে তা উর্দু থেকে

ভিন্ন হয়ে যায়। গ্রিয়র্সন হিন্দুদের উর্দু এবং মুসলমানদের উর্দুতেও প্রভেদ করেছেন। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, কেবল মুসলমানদের উর্দু বাক্য রচনায় ফারসী ক্রম লক্ষ করা যায়। তবে তাঁর এই অভিমত অনেক ভাষাবিদ্ মান্য করতে রাজী নন।

ভাষা পরিবারের নির্মাণ এবং ভাষার বিকাশের প্রক্রিয়ায় কখনোই ধর্মকে নিয়ামক শক্তিরূপে দেখা উচিত নয়। মুসলমানগণ ঈশ্বরকে 'খোদা' বলে আবার 'আল্লা'ও বলে। 'খোদা' ফারসী শব্দ এবং 'আল্লা' আরবী শব্দ। ভারতের সর্বত্র তারা তাদের ধর্মীয় প্রার্থনাকে নমাজ বলে। এই শব্দটিও ফারসীর অন্তর্গত। ফারসী ভাষাও আবরী শব্দকে আত্মস্থ করে। ফারসী কেবল উচ্চ সাংস্কৃতিক স্তরের শব্দাবলীকে আরবী থেকে গ্রহণ করেনি, তার মূল শব্দ ভাণ্ডারেও হাজার হাজার আরবী শব্দ আছে যা ফারসীর মাধ্যমে ভারতীয় ভাষায় ন্যূনতম মাত্রায় এসেছে।

ইসলাম ধর্ম বহু ভাষাভাষী দেশে বিস্তার লাভ করে। বৌদ্ধ, হিন্দু, ঈসাঈ ধর্মও বহু ভাষাভাষী জাতিতে বিস্তার লাভ করে। ঈসাঈ ধর্ম আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করে এবং পরে ইউরোপে। ইউরোপীয় সভ্যতা সেখানকার বহু দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা ও বহু সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের দ্বারা গঠিত। তেমনি ভারতীয় সংস্কৃতির নির্মাণে এখানকার বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ঈসাঈ, মুসলমান সব ধর্মের লোক যোগ দেয়; তা কেবল হিন্দুদের সংস্কৃতিই নয়।

লখনউ এবং হায়দ্রাবাদের হিন্দু-মুসলমান তাদের কথ্য ভাষায় ফারসী শব্দের ব্যবহার বেশি করে। বিহার ও মধ্যপ্রদেশের মুসলমান এই ফারসী শব্দের স্থানে হিন্দী বা সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ করে। এটি স্থানীয় ভেদ,—ভাষাবিদ্‌গণ মনে করেন তাতে দুটি ভাষার নির্মাণ হয় না। হিন্দী এবং উর্দু ভাষার ব্যাকরণ এক, বাক্যরচনা পদ্ধতি এক, শব্দ ভাণ্ডার এবং ক্রিয়া এক—সেই কারণে বলা যায় হিন্দী-উর্দু ভাষার দুটি ক্রম নয়। হিন্দী উর্দুর সব থেকে প্রথম পার্থক্য লিপিগত। কিন্তু লিপি লেখার কাজে আসে, বলার কাজে নয়। সেই কারণে অনেক ভাষাবিজ্ঞানী এই লিপিগতভেদকে ভিত্তিমূলক বলে মনে করেন না।

ভাষাবিজ্ঞানীগণ মনে করেন হিন্দী-উর্দু এক হওয়া আবশ্যক এবং তা আমাদের ঐতিহাসিক বিকাশের জন্য জরুরি। আমাদের মনে রাখতে হবে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন পৃথকভাবে বিকশিত হয়নি, তা অখিল ভারতীয় জীবন প্রবাহের এক ধারা। এখানকার ভাষাও একে অপরকে প্রভাবিত করে। আর সেই প্রভাবের কারণেই বাংলা ভাষার সঙ্গে উর্দুর এক আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

উর্দু পৃথক কোনো সম্প্রদায়ের ভাষা নয়। এটি একটি সাহিত্যিক তথা সাংস্কৃতিক ভাষা। সুতরাং এর ব্যবহারের এবং প্রসারের সুযোগ মেলা আবশ্যক। বাংলা-হিন্দী-উর্দু ভাষার

শব্দভাণ্ডারে আদান-প্রদানের অনেক সুযোগ আছে। উভয় ভাষার শব্দের আদান-প্রদানে সাহিত্য ক্ষেত্রও উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হবে। ব্যাকরণগত এবং মূল শব্দভাণ্ডারগত দৃষ্টিতে উর্দু সংস্কৃত পরিবারের ভাষা, আরবী পরিবারের নয়। সামাজিক জীবন-পরিস্থিতি উভয় ভাষাকে একে অপরের কাছে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে। রামবিলাস শর্মা হিন্দী ও উর্দুকে কখনো দুটি পৃথক পৃথক ভাষা হিসেবে স্বীকার করেন নি। তিনি উভয়কে একই ভাষা মনে করেন। কারণ তিনি ভাষাকে জাতীয়তা এবং জাতীয়তাকে রাষ্ট্রীয়তার সঙ্গে যুক্ত করেন। আর এই রাষ্ট্রীয়তাকে অখণ্ড রাখার জন্য তিনি হিন্দী ও উর্দুর একতাকে আবশ্যক বলে মনে করেন।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ এবং হায়দ্রাবাদে লেখকগণ ভাষার স্বরূপে ক্রান্তিকারী পরিবর্তন আনেন। আর তার ফলেই আজকের উর্দুর জন্ম; ভারতীয় সংস্কৃত নিষ্ঠ এবং সংস্কৃতাশ্রয়ী শৈলীকে যে ত্যাগ করে এবং যাকে আধুনিক দৃষ্টিতে বাস্তবিকপক্ষে 'হিন্দীর মুসলমানী রূপ' বলে ভাষাবিদ্‌গণ অভিহিত করেছেন। তবে ভাষা কোনো ধর্ম বা জাতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত কোনো সাধারণ বিষয় নয়। উর্দু ভাষার ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য; কারণ 'উর্দু' হিন্দু তথা মুসলমান জাতির যৌথ সম্পদ। আসলে উর্দু ভাষার লিপিগত স্বাতন্ত্র এই ভাষাকে পৃথকত্ব দান করেছে। উর্দুলিপি ফারসী লিপির পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ এবং ফারসীলিপি আরবীলিপির পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। উর্দু ভাষার জন্ম মুসলমানদের বাদশাহী মহলে হয়েছে এবং যেখানে পরিশীলিত হয়েছে একথা সত্য। কিন্তু একথাও উল্লেখনীয় যে বহু হিন্দু লেখক উর্দু ভাষাকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। উর্দু ভাষাকে পরিশীলিত রূপ দানের ক্ষেত্রে হিন্দুমুসলমান উভয় জাতিই সমানভাবে অগ্রসর হয়েছে। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এই অভিমত প্রকাশ করেছেন—"কেবল বাঙ্গালা য়া গুজরাটী, পাঞ্জাবী য়া মারাঠী কা জ্ঞান কিসী ব্যক্তি কো প্রান্তো কে সংকুচিত ক্ষেত্র তক হী সীমিত রখ সকতা হ্যায়; সর্বসাধারণ কী ভাবনা ভী য়হী হ্যয়। ইস প্রকার হম দেখতে হ্যায় কি হিন্দুস্থানী উত্তরী য়া আর্য় ভারতকে বাতাবরণ মে পূর্ণতয়া ছাঈ হুঈ হ্যায়।"[১৮]

ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'নাগরী হিন্দী' এবং 'হিন্দুস্তানী' অর্থাৎ উর্দু ভাষা এমনই মাধ্যম যা সমস্ত ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম। আর সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতায় আসা ভিন্ন প্রদেশের মানুষকে হিন্দী তথা হিন্দুস্থানী ভাষা কমবেশী জানতেই হয়, আবার একজন বাঙালী তার হিন্দী তথা হিন্দুস্থানীর জ্ঞানের দ্বারা ভারতের পশ্চিমী কোণ পর্যন্ত সহজেই বিচরণ করতে পারে।

বাংলায় যে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তাকে অখিল ভারতীয় রূপদানে সচেষ্ট হন মহান ব্যক্তিগণ। স্বদেশী আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র

সেন, ভূদেব মুখার্জী, স্বামী বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বাংলার সকল রাষ্ট্রীয় বিচারধারার লেখক, যারা স্বদেশী আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করেছিলেন, সর্বদাই এক অবিভাজ্য ভারতের কথা ভাবতেন। রাষ্ট্রীয় একতাকে সফল রূপদানের ক্ষেত্রে বাংলা-হিন্দী হিন্দুস্থানী ভাষাকে সম্মিলিত করার বিষয়ে তাঁর বিশেষ যত্নবান ছিলেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর তুর্কী বিজয়ের পরবর্তীপর্বে উত্তর ভারতের সমস্ত 'বোলী' তথা ভাষার প্রাচীনতম ও সরলতম নাম 'হিন্দী'। 'হিন্দুস্তানী' বহু পরের সৃষ্ট শব্দ। অনেকের মতে 'হিন্দুস্তানী' হল 'হিন্দীর মুসলমানী রূপ' উর্দূর সদৃশ এমন এক শ্রেণীর ভাষা, যা আরবী ফারসী শব্দ বহুল এবং যেখানে হিন্দী এবং সংস্কৃত উপাদানকে যথাসম্ভব বর্জন করা হয়েছে। আবার ভাষাশাস্ত্রের অনেক বিদ্বানগণ এমন অভিমত প্রকাশ করেন যে 'সাধুহিন্দী' বা 'নাগরী হিন্দী' এবং 'উর্দু' এই দুই এর মূলাধার রূপ ভাষার নামই 'হিন্দুস্তানী'। কিন্তু এই সকল অভিমতের বিরুদ্ধে গিয়ে অধিকাংশ ইংরেজ এবং অন্যান্য বিদেশী তথা ভারতীয় ব্যক্তিত্ব 'হিন্দুস্তানী' বা 'উর্দু'কে হিন্দীর সেই বিশেষ এক শৈলী বলে মনে করেন যা ফারসীলিপিতে লেখা হয় এবং যেখানে আরবী ফারসী শব্দের বাহুল্য থাকে। এই 'হিন্দুস্তানী' শব্দের ভারতীয় রূপ 'হিন্দুস্থানী', আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা অনুসারে 'স্থান' শব্দ প্রাচীন পারসিক 'স্তান' > আধুনিক ফারসী 'আস্তান বা ইস্তান'। সংস্কৃত 'স্থান' এর ভারতীয়করণ করে আমরা 'হিন্দুস্থান' শব্দটি পাই। এর মূল রূপ সাধারণ বোলচালের উত্তর ভারতীয় সার্বজনীন ভাষার বলে মনে করা যায়। 'হিন্দুস্থানী' বা 'হিন্দুস্তানী' এই দুই শব্দ রূপ মারাঠী, গুজরাটী এবং বাংলায় তথা দক্ষিণের ভাষায় প্রচলিত (তামিল ছাড়া)।

নাগরী-হিন্দী বা উর্দুরূপে হিন্দুস্থানী ভাষা আজকের ভারতীয়ের জন্য মহান সম্পদ। এটি আমাদের ভাষাবিষয়ক প্রকাশ মাধ্যমের এক মহোত্তম সাধন, তথা ভারতীয় একতা এবং রাষ্ট্রীয়তার প্রতীক রূপে পরিগণিত হতে পারে। হিন্দী এক মহান সম্পর্ক সাধক ভাষা। অন্যদিকে উর্দু, যার আরবী ফারসী শব্দাবলীর প্রভাব ও লিপিগত ভিন্নতা ছাড়া বৌদ্ধিক তথা সাংস্কৃতিক শব্দাবলী সর্বভারতীয় সাহিত্যিক অঙ্গ তথা আদর্শ হিন্দী থেকেই প্রাপ্ত। বর্তমানে হিন্দুস্থানীর উপর ইংরাজী ভাষার প্রভাবও পড়েছে। সকল মহান অন্তর্রাষ্ট্রীয় ভাষার মতো হিন্দুস্থানীও দেশের সংকুচিত অংশকে ছেড়ে বিশ্বকোষীয় মর্যাদা লাভ করেছে।

'হিন্দুস্তানী' শব্দ দ্বারা আরবী-ফারসী মিশ্রিত উর্দুর বিশুদ্ধ রূপকেই মানুষ বুঝে থাকেন। পূর্বী পাঞ্জাব এবং পশ্চিমী উত্তর প্রদেশের কিছু অংশ তথা হায়দ্রাবাদ্ দক্ষিণের মুসলমান তাদের বাক্যালাপে উর্দুর বিশুদ্ধ রূপের ব্যবহার করে থাকেন। তবে শিক্ষা তথা সামাজিক স্তর অনুসারে এতে ন্যূনতম পরিমাণে স্থানীয় ভাষার মিশ্রণও থাকে। যেমন সুসংস্কৃত পাঞ্জাবী

মুসলমান নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপের ক্ষেত্রে পাঞ্জাবী ভাষা ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন না। তবে আত্মাভিমানের ভাবনার দৃষ্টিকোণ থেকে উর্দু তার শুদ্ধ রূপে বহু উত্তর ভারতীয় মুসলমানের ঘরের ভাষাই হয়ে গেছে। কিন্তু সেই অর্থে বাঙালী মুসলমান তেমনভাবে উর্দু ভাষাকে আপন করতে পারেনি। তবে সময়ের সাথে সাথে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন ঘটে। পূর্ববঙ্গের বহু মুসলমান উর্দু ভাষাকে 'নবীজী কী ভাষা' অর্থাৎ 'পয়গম্বর মুহম্মদ সাহেবের ভাষা' বলে অভিহিত করেন। বাংলার দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দুকে ফারসী তথা আরবীর সাথে সাথে এক প্রাচীন রীতি সমৃদ্ধ বা উচ্চশ্রেণীর ভাষার পদ প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমানে হিন্দুস্থানী বা উর্দুভাষা তিনটি লিপিতেই লেখা হয়ে থাকে। দেবনাগরী, ফারসী এবং রোমান। অবশ্য এই তিনরূপের মধ্যে নাগরীলিপিই প্রধান। একথা বলাই বাহুল্য যে হিন্দুস্থানীর জন্মই দেবনাগরীর বক্ষে হয়েছে। আর রোমানলিপিতে লেখা উর্দু ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যবিভাগে ইংরেজীর পর দ্বিতীয় রাজ ভাষার স্থান দখল করেছিল। ব্রিটিশ সৈন্যবিভাগ হিন্দুস্থানী জানা সৈন্যদের জন্য রোমানলিপিতে উর্দুর কিছু ছোট ছোট পুস্তিকাও প্রকাশ করত। উল্লেখ্য ভারতীয় আগ্নেয়াস্ত্র দলের আদর্শ বাক্য ছিল 'ইজ্জত'-ও ইকবাল' (সম্মান এবং সৌভাগ্য); যার দুটি শব্দ উর্দু ভাষায় আরবী থেকে নেওয়া হয়েছে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উর্দু ভাষার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন—

"য়হ এক এয়সী কৃত্রিম ভাষা নহী থী জিসকা উদ্ভব দিল্লীকে তুর্ক শাকসোঁ কে দরবারো তথা ফৌজী ডেরোঁ মে হুয়া হো। ইসকা নাম সর্বপ্রথম 'হিন্দী' ইয়া 'হিন্দ্বী' (হিন্দবী) থী, জিসকা অর্থ 'হিন্দ' ইয়া ভারত কী অথবা 'হিন্দুও' কী ভাষা থী। দুসরা নাম 'জবানে উর্দু' (ফৌজী ডেরেকী ভাষা) বহুত আগে চলকর ১৭ বী শতাব্দীকে অন্ত মেঁ উস সময় প্রচলিত হুয়া, জবকি মুগল সম্রাটনে দক্ষিণ কে মুসলমান রাজ্য তথা মরাঠোঁ কা দমন করণে কে লিএ দলপর দল ভেজনা আরম্ভ কিয়া, অর মুগল সেনা কে সাথ দক্ষিণ মে দিল্লী কী বোলী ভী সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হোনে লগী।"[১৯]

তিনি আরো বলেন—

'উর্দু শব্দ কা 'রাজা কে রহনে য়া ঠহরনে কা নগর ইয়া স্থান' ইস অর্থ মে প্রয়োগ অকবর কে কুছ সিক্কো পর মিলতা হ্যায়। য়হ শব্দ বাস্তব মে তুর্ক বিজেতাওঁ কে সাথ আয়া থা। অপনে মূল স্বরূপ মে য়হ এক অলতাঈ শব্দ হয়, জো বিভিন্ন তুর্কী ভাষাওঁ এবং বোলিওঁ মে 'ওর্দু', 'উর্দূ', 'য়ুর্ত' আদি কঈ রূপোঁ মে পায়া জাতা হ্যায়। 'উর্দু'—য়হ রূপ মূল তুর্কী কা ফারসীকৃত বর্ণবিন্যাস কে কারণ পরিবর্তিত রূপ হ্যায়। মূল তুর্কী শব্দ কা অর্থ হোতা হ্যায় 'প্রধান ব্যক্তিকা তম্বু, ডেরা, ডেরা ডালনা, নিবাস-স্থান' ইত্যাদি। তুর্ক এবং

মগোল সরদারো কে তম্বু হী উনকে দরবার থে, অর বাবর তুর্ক হোনে কে কারণ উসকে দ্বারা চলায়ে হুএ 'মোগল' য়া 'মুগল' বংশকে দরবার কা নাম হুমায়ূ কে সময় সে ফারসীকৃত এবং ভারতীয়কৃত হোতে হোতে ভী মূল তুর্কী শব্দ সে থোড়া সা পরিবর্তিত হোকর 'উর্দু' হো রহা। ফারসী এবং ভারতীয় ভাষা মে অন্তিম দীর্ঘ স্বরোচ্চার কী প্রবণতা রহতী হ্যায়, উক্ত রূপ কা এক কারণ য়হ ভী থা। তুর্কী মে অব তক য়হ শব্দ 'ডেরা', ঘর য়া স্বদেশ কে অর্থ মে প্রযুক্ত হোতা হ্যায়।"[২০]

উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের মতো উর্দু সাহিত্য রচনার ধারা এক সর্বভারতীয়তার মর্যাদা লাভ করে। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিদ্বান জেমস্ গিলক্রাইস্ট (James Gilchrist) হিন্দু এবং মুসলান দুই শ্রেণীর লেখকবর্গকেই উর্দু গদ্যসাহিত্য লেখার জন্য উৎসাহ দান করেন। যার ফলস্বরূপ উর্দুগদ্যের দুই প্রারম্ভিক গ্রন্থ মীর অম্মন-এর 'বাগো-বহার' (পূর্ণত প্রকাশিত ১৮০৪) এবং হাফ়িজুদ্দীন অহমদের 'খরীদ অফ়রোজ়' (১৮০৩-১৮১৫) লেখা হয়। সাথে সাথে নাগরী হিন্দীর দুই আদ্য গ্রন্থ লাল্লুজী লালের 'প্রেমসাগর' (১৮০৩) এবং সদল মিশ্রর 'নাসিকেতোপাখ্যান' (১৮০৩) রচিত হয়। বলাই বাহুল্য উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্য দিয়ে এক পরিশীলিত গদ্য রূপের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটে।

এইভাবে গদ্য মাধ্যম রূপে হিন্দুস্থানী তথা উর্দু আধুনিক জনসমক্ষে এসে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দী সেদিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দী এবং উর্দুর এই যে প্রসার, তা ভারতের জন্য কেন্দ্রিত মুগল সরকারের সব থেকে বড় দান। আসলে ভাষা যখন বোলচালের সীমা থেকে বেরিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন তাকে প্রচলিত সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়। আর এই ভাবে ভাষায় পরিবর্তন সাধিত হয়। পরিবর্তিত অবস্থায় ভাষা বিভিন্নভাবে তার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। আর সেই কারণেই প্রাথমিক উর্দু ভাষার সঙ্গে বর্তমানের ভাষার বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সেই সময় উর্দু ভাষা বোলচালের বা কথ্য ভাষার খুব নিকটবর্তী ছিল, ফলত তাতে উচ্চ কোটির কোনো সাহিত্যিক নিদর্শন মেলে না। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের অলোচনায় তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

দিল্লীর লেখকগণ সর্বপ্রথম উর্দুকে ফারসি লিপিতে লিখে এর কাব্যিক রূপ দান করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রারম্ভিক উর্দু কবির রচনায় হিন্দুস্থানীর 'মুসলমানী রূপ' উর্দুর এই প্রকার প্রতিষ্ঠালাভ হয় যে সেই শতাব্দীতেই উর্দু সর্বসাধারণের ব্যবহারে আসে। ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানীর নব্য-ভারতীয় ভাষার মঞ্চে তার দ্বিমুখ রূপ—নাগরী-হিন্দী গদ্য এবং উর্দু গদ্য কে নিয়ে প্রবেশ করে। আসলে ভাষা যেহেতু সম্পর্কের সূত্রকেই মেনে চলে, তাই উর্দু ভাষার ক্ষেত্রেও সেই বিষয়ের ব্যতিক্রম ঘটেনি। আর আমরা জানি বিশেষ

ভাষার অস্তিত্ব তথা সৃজনী শক্তি ইতিহাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এক্ষেত্রে ভাষা সমাজ সৃষ্টির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত। আর সেইভাবেই মধ্যপ্রাচ্যের বা মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন ভাষাভাষী সৈনীকেরা যখন একই সেনাশিবিরে সমাজ সৃষ্টি করেছিল, তখন সৃষ্টি হয়েছিল উর্দু ভাষার।

বাংলা এবং উর্দু উভয় ভাষার ক্ষেত্রেই একথা অবিসম্বাদিত রূপে সত্য যে ভাষার একটি আঞ্চলিক মাত্রা তথা সামাজিক মাত্রা আছে। সমাজের ভিন্নতায় ভাষার ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। সমাজের প্রতিটি মানুষ তার সামাজিক সম্পদ ভাষার ব্যবহারের পাশাপাশি সৃজনশীল মানবীয় প্রক্রিয়ায় তাকে সম্প্রসারিত করে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। বাংলা এবং উর্দু উভয় ভাষাই সেই ঐতিহ্যের বাহক।

বাংলা এবং উর্দু ভাষা ও সাহিত্য সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। আরবী ফারসী শব্দ দ্বারা বাংলা শব্দ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। এক্ষেত্রে ভাষা কোনো ধর্মীয় আবরণে ঢাকা থাকেনি। উর্দু ভাষার সার্বজনীনত্ব সম্পর্কে রামবিলাস শর্মা বলেন—

'উর্দু কো ন কিসী অলগ কৌম কী, ন কিসী ধর্মবিরোধ কে অনুয়ায়িয়ো কী ভাষা কহা জা সকতা থা। খড়ীবোলী পর ফারসী কা অসর পড়নে সে জো বিশেষ শৈলী বনী, উসকে কারণ সাংস্কৃতিক অর রাজনীতিক থে। ফারসী কে রাজভাষা হোনে অর দরবারী কবিয়োঁ কে ঈরানী শায়রী সে প্রভাবিত হোনে কো হম ধার্মিক প্রক্রিয়া নহী কহ সকতে, উসে সাংস্কৃতিক অর রাজনীতিক প্রক্রিয়া হী মাননা চাহিএ। য়হ ন ভুল না চাহিএ কি হিন্দুওঁ কা বহুত সা ধার্মিক সাহিত্য উর্দু মেঁ লিখা গয়া হ্যায়।'[২১]

যে কোনো ভাষাই সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। ভাষা দ্বারাই মানুষ তার প্রচেষ্টাকে সংগঠিত করে, মানুষ তার অর্জিত জ্ঞানকে উত্তর পুরুষের মধ্যে সঞ্চারিত করে। ভাষা সংস্কৃতির বাহন তথা অঙ্গও বটে। প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব ধ্বনি-প্রকৃতি এবং ভাব-প্রকৃতি থাকে। এগুলি হল ভাষার সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব। কোন ভাষা যখন পরিবর্তিত হয় তখন সেই পরিবর্তনের মাধ্যমে ভাষার বিকাশ ঘটে। ভাষা আদান প্রদানের মাধ্যমে স্থূল অর্থবোধক শব্দ থেকে সূক্ষ্ম অর্থবোধক শব্দে উত্তীর্ণ হয়। সাধারণ অর্থবোধক শব্দের স্তর থেকে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দের দিকে অগ্রসরের মাধ্যমে প্রগতি লাভ করে। ভাষা সমাজ গঠনেও মহত্ত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই সমাজ গঠন তথা সামাজিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে ভাষার উন্নতি সাধনে যত্নবান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তথ্যসূত্র ঃ

১. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, রামেশ্বর শ, পৃঃ ১৫।
২. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, রামেশ্বর শ, পৃঃ ১৫।
৩. এন ইন্ট্রোডাকশান টু লিঙ্গুস্টিক সাইন্স, এডগার এইচ, স্টার্টেভান্ট, চ্যা. ১।
৪. ভাষা প্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ২১।
৫. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, রামেশ্বর শ, পৃঃ ৩।
৬. ভাষা প্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১০।
৭. শহীদুল্লাহ্ রচনাবলী, মহম্মদ শহীদুল্লাহ্, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৬৩।
৮. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, রামেশ্বর শ, পৃঃ ৫৪৫।
৯. হিন্দী উর্দু অর হিন্দুস্থানী, পদ্মসিংহ শর্মা, পৃঃ ২৬।
১০. উর্দু সাহিত্য কা আলোচনাত্মক ইতিহাস, সৈয়দ, এহতিশাম, হুসৈন, পৃঃ ৮।
১১. উর্দু সাহিত্য কা আলোচনাত্মক ইতিহাস, সৈয়দ, এহতিশাম, হুসৈন, পৃঃ ২৫।
১২. উর্দু সাহিত্য কা আলোচনাত্মক ইতিহাস, সৈয়দ, এহতিশাম, হুসৈন, পৃঃ ২০।
১৩. উর্দু সাহিত্য কা আলোচনাত্মক ইতিহাস, সৈয়দ, এহতিশাম, হুসৈন, পৃঃ ৩৫।
১৪. উর্দু সাহিত্য কা আলোচনাত্মক ইতিহাস, সৈয়দ, এহতিশাম, হুসৈন, পৃঃ ১০।
১৫. ভারতীয় আর্যভাষা অর হিন্দী, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ২৫।
১৬. ভারতীয় আর্যভাষা অর হিন্দী, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৬৩।
১৭. বালমুকুন্দ গুপ্ত নিবন্ধাবলী, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১১০-১১১।
১৮. ভারতীয় আর্যভাষা অর হিন্দী, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৬৫।
১৯. ভারতীয় আর্যভাষা অর হিন্দী, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ২০৪।
২০. ভারতীয় আর্যভাষা অর হিন্দী, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ২০৪।
২১. ভাষা অর সমাজ, রামবিলাস শর্মা, পৃঃ ৩২৭।

* প্রকাশক ও প্রকাশকাল গ্রন্থপঞ্জীতে দেওয়া হয়েছে *